ভারতের ইতিহাস

মধ্যযুগ

সূচনা	মধ্যযুগের ভারত-ইতিহাসের উপাদান

ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে মুসলমানদের অবদান কৃতিত্বপূর্ণ। হজরত মহম্মদের সময় থেকে মুসলমানদের মধ্যে ইতিহাস রচনার সূত্রপাত হয়। ইসলামের প্রথম যুগ থেকে হজরত মহম্মদ, খলিফা, সুলতান ও সম্ভ্রান্তদের জীবনী লেখা শুরু হয়। প্রথম দিকে আরবী ভাষায় ইতিহাস রচনা শুরু হয়। পরে দশম শতক থেকে পারসিক জাতীয়তাবাদের পুনরুভ্যুত্থানের ফলে পারসিক ভাষা ও সংস্কৃতির ব্যাপক বিস্তার ঘটে এবং ক্রমে ক্রমে এই ভাষায় ইতিহাস রচনা মুসলমানদের মধ্যে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। ভারতে আগমনকালে মুসলমানরা ফার্সী ভাষায় ইতিহাস রচনার ঐতিহ্য নিয়ে এলেন। একাদশ শতক থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে রাজবংশ সম্পর্কিত ও আঞ্চলিক ইতিহাস, জীবনী, আত্মচরিত প্রভৃতির এক বিশাল ঐতিহাসিক সাহিত্য গড়ে ওঠে। মুসলমান ঐতিহাসিক ও ঘটনাপঞ্জী লেখকরা স্বচক্ষে যা দেখেছিলেন বা লোকমুখে শুনেছিলেন তা পংক্তিবদ্ধ করেছেন। প্রথম দিকে মুসলমান ঐতিহাসিকরা প্রধানত ঘটনাপঞ্জীই লিপিবদ্ধ করতেন। সুতরাং আধুনিক ইতিহাস-লেখন-পদ্ধতির বিচারে তাঁদের যথার্থ ঐতিহাসিক বলা চলে না। তাঁরা ঐতিহাসিক উপাদানগুলি যথাযথভাবে সাজিয়ে বা সেগুলির প্রকৃত মূল্যায়ন না করেই তথ্য পরিবেশন করেছেন। কোন্ তথ্যটি প্রয়োজন এবং কোন্‌টি বা অপ্রয়োজন সেগুলির বিচার ও বিশ্লেষণ তাঁরা করেন নি। প্রথম যুগের মুসলমান ঐতিহাসিকদের অধিকাংশকেই প্রকৃত অর্থে ঐতিহাসিক বলা যায় না। এছাড়া তাঁরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সম্রাটদের কার্যকলাপ, তাঁদের রাজদরবার ও যুদ্ধবিগ্রহের কথাই বেশী বলেছেন। কারণ তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন দরবারী-ঐতিহাসিক ও সম্রাটদের অনুগ্রহপুষ্ট। সম্রাট বা রাজারাজড়াদের স্তুতি ও তাঁদের ঐশ্বর্য ও ক্ষমতার কথা প্রচার করাই ছিল ঐতিহাসিকদের মূল লক্ষ্য। এই কারণে সাধারণ মানুষের জীবন-ধারণ ও তাদের সুখ-দুঃখের কথা এইসব ঐতিহাসিক কর্তৃক রচিত গ্রন্থাদিতে খুব সামান্যই স্থান পেয়েছে। এই ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকা সত্ত্বেও সে যুগের মুসলমান ঐতিহাসিকদের রচিত গ্রন্থাদির মূল্য লাঘব করা যায় না; কারণ তাঁদের রচনাসমূহ সেযুগের বহু ঘটনার ওপর আলোকপাত করেছে। অতিরঞ্জিত ও পক্ষ-পাতদোষে দুষ্ট হলেও একথা স্বীকার করতে হয় যে, সেযুগে ইতিহাস রচনার ধারাই ছিল এই ধাঁচের। একথা অনস্বীকার্য যে, ইতিহাস সম্বন্ধে মুসলমান ঐতিহাসিকদের আদর্শ ছিল মহান্। জিয়াউদ্দিন-বারণী ইতিহাস-চর্চাকে ধর্মশাস্ত্রের চর্চার মত পবিত্র বলে অভিহিত করেছেন। বারণী মন্তব্য করেছেন যে, ঐতিহাসিকের হওয়া উচিত সত্যনিষ্ঠ ও নির্ভীক। তিনি সত্য বিবরণের ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করেছেন। স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, প্রাথমিক মধ্যযুগের ঐতিহাসিকরা যথা—মিন্‌হাজ, হাসান নিজামী, আমীর খসরু, বারণী ছিলেন অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত মৌলবাদী মুসলমান এবং ধর্মীয় গোঁড়ামির যুগের মানুষ। এই কারণে তাঁরা মধ্যযুগের শাসকদের ইসলাম ধর্মের রক্ষক ও সেই সঙ্গে ইসলামের জয়গানে মুখর হয়েছিলেন। তাঁদের পরিবেশিত বিবরণী ও মন্তব্য বিচার-বিবেচনা করে গ্রহণ করাই যুক্তিসঙ্গত।

মুসলমান ঐতিহাসিকদের রচনার গুণাগুণ

মোগল আমলে ঐতিহাসিক রচনার আদর্শ পরিবর্তিত হয়। এই পরিবর্তনের মূলে ছিলেন আকবরের সভাসদ্ ও মিত্র আবুল ফজল। আবুল ফজলের রচনায় যথেষ্ট ত্রুটি ছিল সন্দেহ নেই। আকবর সম্বন্ধে তাঁর বিবরণী পক্ষপাত দুষ্ট। সম্রাটের মহত্ত্ব ও কৃতিত্ব প্রচার করতে গিয়ে তিনি সাধারণ মানুষের জীবন ও তাদের অবস্থা লঘু করে দেখেছেন। প্রাথমিক মধ্যযুগের ঐতিহাসিকদের মত তিনি সমকালীন যুগের প্রকৃতি তুলে ধরতে পারেননি। তা সত্ত্বেও বলা চলে, আবুল ফজল চিরাচরিত ইতিহাস রচনার পদ্ধতি ও ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে এক নতুন পথের সন্ধান দেন। ধর্মনিরপেক্ষ ও বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আবুল ফজলই সর্বপ্রথম ইতিহাস রচনায় ব্রতী হন। হাসানের কথায় "He (Abul Fazl) was the first Indian historian to adopt a rational and secular approach to history".*

মধ্যযুগের ইতিহাস রচনার উপাদান প্রচুর। ভারতের প্রাচীন যুগের মত, মধ্যযুগের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে কেবলমাত্র শিলালিপি, কিংবদন্তী, মুদ্রা ও সাহিত্যে ঐতিহাসিক উপাদানগুলি সংগ্রহ করা কষ্টসাধ্য নয়। ভারতে বিভিন্ন মুসলমান রাজবংশের আমলে রচিত সমসাময়িক ইতিহাস ও ঐতিহাসিক সাহিত্য থেকে মধ্যযুগের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের এক সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি চয়ন করা সহজ। মধ্যযুগের ভারত-ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত উপাদানগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

সুলতানি যুগে সাহিত্যিক উপাদান

মূলত আরবী ভাষায় রচিত 'চাচ্‌নামা' থেকে আরবদের সিন্ধু-বিজয় কাহিনী পাওয়া যায়। ফার্সী-ভাষায় এর অনুবাদ করেন আলি-বিন-হামিদ কুফি (১২১৬-১৭ খ্রীঃ)। এই গ্রন্থে মহম্মদ-বিন্-কাশিমের সিন্ধু অভিযানের পূর্বে ও পরে সিন্ধুদেশের অবস্থা বর্ণিত আছে। বহু অঞ্চলের নাম ও গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। আরবদের সিন্ধু-বিজয়ের প্রামাণিক গ্রন্থ হিসেবে একে গণ্য করা যায়।

'চাচ্‌নামা'

মীর মহম্মদ মাসুম কর্তৃক রচিত 'তারিখ-ই-সিন্ধ' গ্রন্থখানি ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। এই গ্রন্থে আরবদের সিন্ধু অভিযানের সময় থেকে সম্রাট আকবরের রাজত্বকাল পর্যন্ত উল্লেখযোগ্য ঘটনা লিপিবদ্ধ আছে। যদিও একে সমসাময়িক ইতিহাস বলা যায় না, তথাপি আরবদের সিন্ধু অভিযানের পটভূমিকা ও মহম্মদ-বিন্-কাশিমের সাফল্যের কারণগুলি এতে বিধৃত হয়েছে।

'তারিখ-ই-সিন্ধ'

'কিতাব-উল্-ইয়ামিনি' গ্রন্থের রচয়িতা আবু নাসের বিন উত্‌বি। গজনীর সুলতান সুবক্তগীন ও সুলতান মামুদের রাজত্বকাল থেকে ১০২০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এক ধারাবাহিক ইতিহাস এতে লিপিবদ্ধ আছে। তবে এই গ্রন্থখানিকে ইতিহাস না বলে সাহিত্য বলাই সার্বিক সঙ্গত। উত্‌বি সুলতান মামুদের ভারত অভিযানের কিছু বিবরণ দিয়েছেন, যদিও তা নাতিদীর্ঘ। সময় ও তারিখের ভুল-ভ্রান্তি থাকা সত্ত্বেও এই গ্রন্থে সুলতান মামুদের প্রথম জীবন ও তাঁর কার্যকলাপের কিছু উল্লেখযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায়। সে যুগের মূল্যবান রচনা হল অল্-বিরুনী রচিত 'তারিখ-উল্-হিন্দ। অল্-বিরুনী (৯৭০-১০৩৮ খ্রীঃ) সুলতান মামুদের সঙ্গে ভারতে আসেন। তিনি আরবী ও ফার্সী ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। ভারতে কিছুদিন অবস্থান করে তিনি হিন্দুদর্শন, ধর্মসাহিত্য সম্পর্কে গভীর জ্ঞান অর্জন করেন। সে যুগের তিনি ছিলেন এক খ্যাতনামা পণ্ডিত। তিনি দুটি সংস্কৃত গ্রন্থ আরবী ভাষায় এবং কয়েকটি আরবী-গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করেন।

'কিতাব-উল্-ইয়ামিনি'

'তারিখ-উল্-হিন্দ'

---

* *এম. হাসান—Medieval Indian Historians—(P.XIII).*

'তারিখ-উল্-হিন্দ' থেকে একাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ভারতের ধর্ম, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও দর্শন সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। অল্-বিরুনী প্রতিটি বিষয় সূক্ষ্মভাবে বিচার-বিশ্লেষণ করে তা লিপিবদ্ধ করেছেন। সুলতান মামুদের ভারত অভিযানের প্রাক্কালে ভারতের অবস্থার এক মনোজ্ঞ বিবরণ এতে পাওয়া যায়।

'তাজ-উল্-মাসির'

হাসান-নিজামি-রচিত 'তাজ-উল্-মাসির'-এ ১১৯২ থেকে ১২২৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ঘটনাবলীর বিবরণ আছে। এই কারণে কুতব্উদ্দিন-আইবেক ও ইলতুৎমিস-এর রাজত্বকালের প্রথম দিকের এক প্রামাণিক গ্রন্থ হিসেবে একে গণ্য করা যায়। মহম্মদ-বিন্-ঘোরীর ভারত অভিযানের সময় হাসান-নিজামি ভারতে আসেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তিনি ছিলেন সমকালীন ঐতিহাসিক। দিল্লীর সুলতানি রাজত্বের প্রারম্ভিক পর্বের ইতিহাস সম্বন্ধে এই গ্রন্থের মূল্য অনস্বীকার্য।

'তাবাকাৎ-ই-নাসিরি'

'তাবাকাৎ-ই-নাসিরি'-গ্রন্থের রচয়িতা মিন্হাজ-উস-সীরাজ। এই গ্রন্থটি মুসলিম জগতের এক সাধারণ ইতিহাস। এই গ্রন্থের বৈশিষ্ট্য হল এই যে, এতে মহম্মদ ঘোরীর ভারত অভিযানের অনুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায়। ১২৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লীর তুর্কী-সাম্রাজ্যের এক ধারাবাহিক ইতিহাস এতে সন্নিবিষ্ট আছে। মিন্হাজ যে শুধু সমকালীন ব্যক্তি ছিলেন এমন নয়, তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার সঙ্গে নিজেই জড়িত ছিলেন। তিনি দিল্লীর প্রধান কাজীর পদে কিছুদিন অধিষ্ঠিত ছিলেন। তাঁর বর্ণিত ঘটনা এবং সন ও তারিখ মোটামুটিভাবে গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হয়েছে।

'খাজাইন-উল্-ফুতুহ্'

দিল্লীর সুলতানি আমলের এক উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক হলেন আমীর খসরু। তিনি ছিলেন দিল্লীর দরবারের সভা-কবি ও ঐতিহাসিক। ১২৯০ থেকে ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সুতরাং, তিনি জালাল-উদ্দিন খাল্জী থেকে মহম্মদ-বিন্-তুঘলক পর্যন্ত দিল্লীর সুলতানদের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি বহু উল্লেখযোগ্য ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন—এই কারণে তাঁর বিবরণীর ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। 'খাজাইন-উল্ ফুতুহ্' নামক গ্রন্থে আলাউদ্দিন খাল্জীর দাক্ষিণাত্য, বরঙ্গল ও মাবার অভিযান, তাঁর প্রশাসনিক সংস্কার, মোগল আক্রমণ প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ের বিবরণ পরিবেশিত হয়েছে। খাল্জী ও তুঘলক রাজত্বের ইতিহাসের জন্য এই গ্রন্থখানি খুবই মূল্যবান। এছাড়া আমীর খসরুর অন্যান্য 'মসনবী' বা ঐতিহাসিক কাব্যের মধ্যে 'কিরাণ-উস-সাদাইন', 'মিফ্তা-উল-ফুতুহ', 'তুঘলকনামা' উল্লেখ করা যায়। আমীর খসরুর কাব্যগুলি ঐতিহাসিক তথ্যে ভরপুর। রাজ-সভাসদ্ ও সরকারী কর্মচারী হওয়ায় তাঁর পক্ষে সরকারী দলিলপত্র দেখবার ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের কাছ থেকে সরাসরি সংবাদ আহরণ করা সহজ ছিল। সময়ানুক্রমিক ভাবে তথ্য পরিবেশন করার ক্ষেত্রে বারণী অপেক্ষা আমীর খসরু বেশী পারদর্শী ছিলেন। তাঁর উল্লিখিত সন ও তারিখগুলিও অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে।

'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী'

ঐতিহাসিক উপাদানরূপে জিয়াউদ্দিন-বারণী রচিত 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' গ্রন্থখানি এক অমূল্য সম্পদ। বারণী ছিলেন অভিজাতবংশসম্ভূত। তাঁর পূর্বপুরুষেরা খাল্জী সুলতানদের আমলে উচ্চপদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জিয়াউদ্দিন নিজেই মহম্মদ-বিন্-তুঘলক ও ফিরোজ তুঘলকের সভাসদ্ ছিলেন। সুলতান বলবনের সিংহাসন আরোহণের সময় থেকে ফিরোজ তুঘলকের রাজত্বের প্রথম ছয় বছর—এই সময়ের ঘটনাবলী এই গ্রন্থে বর্ণিত আছে। আলাউদ্দিন খাল্জী ও মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের রাজস্ব-সংস্কারগুলির মনোজ্ঞ বিবরণ এতে সন্নিবিষ্ট আছে।

তুর্ক-আফগান যুগের অপর খ্যাতনামা ঐতিহাসিক ছিলেন খাজা আবদুল্লাহ্ মালিক ইসামি। তাঁর রচিত 'ফুতুহ্-উস-সালাতিন' অর্থাৎ 'রাজাদের (ভারতের) বিজয়' গ্রন্থখানি গ্রন্থকারের

ভগ্নহৃদয়ের ফল।* ইসামির পূর্বপুরুষেরা সুলতান ইলতুৎমিসের আমলে বাগদাদ থেকে ভারতে আসেন এবং দিল্লীর সুলতানদের অধীনে সরকারী-পদে নিযুক্ত হন। মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের আদেশে রাজধানী দেবগিরিতে স্থানান্তরিত হলে ইসামিও সেখানে যেতে বাধ্য হন। বহু নিরাশা-হতাশার মধ্যে তিনি তাঁর কাব্য-প্রতিভার কীর্তি রেখে যাওয়ার উদ্দেশ্য নিয়ে এই গ্রন্থখানি রচনা করেন। এই গ্রন্থে গজনীর সুলতান মামুদের সময় থেকে মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের রাজত্বকাল পর্যন্ত এক ধারাবাহিক বিবরণ সন্নিবিষ্ট আছে। আলাউদ্দিন খাল্‌জী ও মহম্মদ-বিন্-তুঘলকের রাজত্বের অনেক মূল্যবান তথ্য এই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

'ফুতুহ্-উস-সালাতিন'

আফগান রাজত্বকালের কোন সমসাময়িক ইতিহাস নেই এবং এই সময়ের ঐতিহাসিক উপকরণের জন্য আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে রচিত গ্রন্থাদির ওপর নির্ভর করতে হয়। আব্বাস সারওয়ানী রচিত 'তারিখ-ই-শেরশাহ্' এবং নিয়ামৎ-উল্লাহ্ রচিত 'মাখজাম-ই-আফগানা'—এই আমলের উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ।

আফগান আমলের সমসাময়িক ইতিহাসের অভাব